চতুর্থ অধ্যায়

মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৩)

মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে মধুসূদন যেমন 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটক রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারটি পত্রের মধ্যে নয়টিরই নায়িকা মহাভারতের চরিত্র। এছাড়াও চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে একাধিক কবিতা রয়েছে। তিনি কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সনেট রচনা করেছেন। 'পাণ্ডববিজয়', 'মৎস্যগন্ধা', 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর', 'সুভদ্রাহরণ', 'দুর্যোধনের মৃত্যু' ইত্যাদি কয়েকটি খণ্ডকাব্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে মহাভারতের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের নিদর্শন রয়েছে। বস্তুত কাব্য, নাটক এবং সনেটে মধুসূদন যে সব পুরাণকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে মহাভারত অন্যতম।

নাট্যসমালোচক অশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মহাভারতের প্রতি মধুসূদনের বিশেষ আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন -

> ''মহাভারতের বীররস মধুসূদনকে সর্বদাই আকর্ষণ করিয়াছিল, মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে বীররস পরিবেশন সার্থক হয় নাই, এই বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলিয়াই মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে নানা বিষয়বস্তু তিনি সর্বদা সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মূল কবি-প্রকৃতিই বীররসাত্মক কাহিনী রচনার বিরোধী ছিল বলিয়া মহাভারতের কোন কাহিনীকেও তিনি এই উদ্দেশ্যে যথাযথ নিয়োজিত করিতে পারেন নাই।''[১]

শর্মিষ্ঠা-র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মধুসূদনের জীবনীকার জানাচ্ছেন যে -

> ''নাট্যকারের নিজের জীবনে এই নাটকের দৃশ্যগুলো আগেই অভিনীত হয়ে গেছিল। . . . কবি মাদ্রাস থেকে গৌরদাসকে যখন লিখেছিলেন, একটি চমৎকার স্ত্রী এবং চার সন্তান নিয়ে তিনি বেশ সুখে আছেন, তার ৩৯ দিন পরে তিনি সেই চমৎকার স্ত্রী এবং সন্তানদের ফেলে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হন। খুব সম্ভব হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর

> প্রণয়ের খবর আবিষ্কার হবার ফলেই তাঁর সংসার নাটকীয় ভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল। দেবযানীর মতো রেবেকাও যদি এমনি আকস্মিকভাবেই হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির গোপন প্রেমের কথা জেনে থাকেন, তা হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। এমন কি এই গোপন কথা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর কোনো সন্তানের ভূমিকা থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।''[২]

নাটকের শেষে দেখা যায় দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা দুজনেই যযাতির সঙ্গে সুখে জীবন যাপন করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে মধুসূদন যে সমাধান পাননি, মহাভারতের কাহিনির আশ্রয় নিয়ে সেই অচরিতার্থ স্বপ্নকেই মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর নাটকে। 'মহারাজ, এক বিশাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।'(৫/২)

মহাভারতের আদিপর্ব থেকে মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে রামায়ণের বিষয়কে যথেচ্ছ পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এই নাটকের বয়নে মূল ঘটনাকে প্রায় একই রেখেছন। তবু দেবযানী শর্মিষ্ঠা যযাতি –এই চরিত্রগুলির ওপর উনবিংশ শতকের নবজাগরণের আলো প্রতিফলিত হয়ে মহাকাব্যের চিরন্তন আবেদনকে ভিন্নভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত করে। 'শর্মিষ্ঠা'র নাট্যাখ্যান ও চরিত্রগুলি মূল কাহিনি থেকে কীভাবে বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক বলয়ের মধ্যেও আধুনিকতার স্পন্দন এনেছে তা অনুধাবন করার জন্য তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন।

মহাভারতে দেবযানীর পরিচারিকার নাম ছিল ঘূর্ণিকা, মধুসূদন তাকে পূর্ণিকা নামে দেবযানীর সখী করেছেন। সংস্কৃত নাটকে সখী ছাড়া নায়িকা নেই, বয়স্য ছাড়া রাজা নেই। তারই প্রভাবে সৃষ্ট শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকা এবং যযাতির বিদূষক মাধব্য যা অভিজ্ঞানশকুন্তলার বয়স্যের নামানুসারে এ নাটকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। শুক্রাচার্যের শিষ্য কপিল, বকাসুর এবং একজন দৈত্য নাটকের প্রয়েজনে সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার কলহের সংবাদে নাটকের সূত্রপাত হয়েছে। নাট্যকার প্রত্যক্ষ ভাবে এ ঘটনাকে মঞ্চে আনেননি, তা বকাসুর ও দৈত্যের কথোপকথনে জানা যায়। মহাভারতের সর্বজনজ্ঞাত এই কলহকে মধুসূদন গুরুত্ব দিতে চাননি। বকাসুরের সংলাপে 'স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল' এবং দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা 'উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্তা' বলে উল্লেখমাত্র করে নাট্যকার পরবর্তী ঘটনায় অগ্রসর হয়েছেন। মহাভারতে এই কলহের প্রত্যক্ষ সংলাপ, ''রে অসুরকন্যা! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস?''[৩] –নাটকে এই সংলাপ অনুপস্থিত। কাশীরামও একটি কথায় যে স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়েছেন নাটকে দৈত্য ও বকাসুরের বর্ণনায় তা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

''দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রী হৈয়া বস্ত্র এই পরিস আমার।।''[৪]

এই চরিত্র দুটিকে বুঝেনেয়ার জন্য নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে -

> ''অন্য সময়ে হলে অথবা একান্তে হলে শর্মিষ্ঠা হয়তো তবু খানিকটা মেনে নিতেন দেবযানীর দাপট। কিন্তু এতগুলি সমবয়সি সখী-বান্ধবীর সামনে দেবযানী তাঁকে যখন শুধু অসুরঘরেরে মেয়ে বলেই অভদ্র আচরণের দায়ে গালি দিলেন শর্মিষ্ঠা তখন আর সইতে পারলেন না। একে রাজরক্ত, তাতে অন্যায়টাও তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, গভীর তো নয়ই।''[৫]

স্পষ্টতই মহাভারতের যে অংশটি মধুসূদন নির্বাচন করেছেন তা অত্যন্ত নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। মূল কাহিনিতে বরাবর দেখা গেছে পিতা শুক্রাচার্যের থেকে কন্যা দেবযানীই প্রখরতর এবং শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে নিযুক্ত করার কথা দেবযানীই স্বমুখে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত শুক্রাচার্য দেবযানীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ''বোধহয় তুমি কোনো পাপকর্ম করিয়া থাকিবে, তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছে।''[৬] অতপর কন্যাকে শান্ত করার জন্য বৃষপর্বাকে বলেন, 'তুমি দেবযানীকে প্রসন্না কর।' কিন্তু নাটকে শুক্রাচার্য সারাসরি বৃষপর্বাকে বললেন, 'এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, আমার এই ইচ্ছা।'(১/১) কিন্তু কাশীরামে দেবযানী নিজেই দৈত্যরাজ বৃষপর্বাকে বলেন –

''শর্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
সহচরী সহ মোর করি দেহ দাসী।।''[৭]

আবার দেবযানীর এহেন করুন অবস্থা দেখে কাশীরাম বাঙালি পিতার মতো আচরণ করেছেন-

''বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু মুছায় বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ।।''[৮]

শুক্রাচার্যের এই পিতৃহৃদয়টির প্রতি আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ''মধুসূদনের শুক্রাচার্য কন্যার প্রতি স্নেহান্ধ বাঙ্গালী জনক চরিত্র মাত্র।''[৯] মহাভারতে বৃষপর্বা গুরু শুক্রাচার্যের ক্রুদ্ধ অভিযোগ শোনামাত্রই দেবযানীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এক পরিচারিকাকে আদেশ দিয়ে পাঠালেন, ''দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা আবিলম্বে সম্পাদন করুক।''[১০] নাটকে পিতৃহৃদয়ের বেদনা ও দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে, 'রাজ দুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদগদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন, আর বল্লেন, বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ।'(১/১)

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা সরলা বালার মতো বলেছেন, 'ঐ ব্রাহ্মণ কন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়।'(১/২) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী শর্মিষ্ঠার ভেতর দেখেছেন –

> ''শর্মিষ্ঠা রাজার ঘরের মেয়ে, রাজশাসন এবং রাজার ধর্ম জন্ম থেকে ক্রিয়া করে রাজবাড়ির পুত্র-কন্যাদের মধ্যে। নিজের আত্মসম্মনের চেয়ে রাজ্যের প্রয়োজনটাকে অনেক বড় করে দেখতে শেখাটা খুব সহজ নয়। শর্মিষ্ঠা সেটা শিখেছেন ভালভাবেই।''[১১]

কাশীরাম পণ্ডিতি ভাষা প্রয়োগ না করে অবলীলায় বলেন –

''জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ।।
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে।।''[১২]

নাটকের প্রথম দৃশ্যে মূল চরিত্রগুলির কাউকেই দেখা যায়নি। মহাভারতের দেবযানী নিজেই যযাতির রূপগুণে সম্মোহিতা হয়ে জাতিভেদ ভুলে পিতা শুক্রাচার্যের সম্মতি না নিয়েই যযাতিকে বরণ করতে চেয়েছেন। চতুরা দেবযানী ইচ্ছে করেই যযাতিকে বলেছেন, যেন তাঁর দক্ষিণহস্ত ধরে তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন যাতে আক্ষরিক ভাবেই পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যায়। মধুসূদন দেবযানীর 'হস্তধারণপূর্বক উত্তোলনের'র কথা বললেও এটিকে পরবর্তীকালে বিবাহের প্রমাণ বলে উল্লেখ না করে রূপমুগ্ধতার রোমান্সরূপে উপস্থাপন করেছেন সখী পূর্ণিকার কাছে বিবরণের মধ্য দিয়ে। যে দেবযানী যযাতিকে হৃদয় দান করবার পর পরিচারিকাকে পিতার অনুমতি সংগ্রহে প্রেরণ করেন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে, নাটকের দেবযানী সেখানে পিতার কাছে তা উল্লেখ করতেও সত্রাসে বলেন– 'এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়।'(১/২) অবশ্য মহাভারতের শুক্রাচার্যের মতো নাটকেও তিনি সহাস্যে এ বিবাহ অনুমোদন করেছেন এবং তাঁর শিষ্য কপিলকে যযাতির কাছে প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি গর্ভাঙ্কে যযাতির বিরহ, বিবাহ ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। যযাতি চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের এই সংযোজন সংস্কৃত নাটকসুলভ রাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। কালিদাসের প্রভাব তথা প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের রূপমুগ্ধতার চিত্র সন্নিবেশে মধুসূদন মহাভারতের আখ্যানধারা থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মহাভারতের যযাতিকে এক ধর্মনিষ্ঠ রাজা রূপে দেখা যায়। মধুসূদনের যযাতি রূপমুগ্ধ বিরহী পুরুষ, প্রাচীন ভারতের একজন বিলাসী ও ভোগপ্রিয় রাজা। ফলে ন্যায় ও ধর্মের অনুসরণকারী যযাতির যে ব্যক্তিত্ববান চরিত্রটি পরিশেষে শুক্রাচার্যের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিতে পারে, নাটকের যযাতি তা পারেন না।

নাগরিকগণ যযাতির ঔদাসীন্যকে সমালোচনা করেছেন, 'মহারাজ রাজকার্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে।'(২/১) দ্বিতীয় নাগরিক মহারাজের এরূপ

অবস্থার জন্য সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করেছেন এইভাবে, 'দৈত্যদেশের রমনীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুনে নিপুণ; সুতরাং নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধকরি সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে।'(২/১) এ সকল চরিত্রগুলি আমদানি করার দরকারই হতোনা যদি নাট্যকার শর্মিষ্ঠা সহযোগে দেবযানীর সঙ্গে যযাতির পুনর্বার সাক্ষাৎ ঘটাতেন। মহাভারতের এই অংশটির মধ্যেই শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির সম্পর্কের বীজ নিহিত রয়েছে। দেবযানীও বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর নিজের চেয়ে শর্মিষ্ঠা রাজার চোখে পড়েছে বেশি। দেবযানীর সামনেই তিনি শর্মিষ্ঠার রূপের প্রশংসা করেন এবং দুজনের রূপের তুলনা করে দেবযানীকে বলেন, ''তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু এই মেয়েটির সৌন্দর্যের কাছে তোমার সৌন্দর্য কিছুই নয়–অস্যা রূপেণ তে রূপং ন কিঞ্চিৎ সদৃশং ভবেৎ।''[১৩] শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠা বিষয়ে যযাতিকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন, ''কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয় হইবেন; তুমি কদাচ ইহাকে পরিণয় করিও না।''[১৪] কাশীরাম ছোট করে আসল কথাটি বললেন – ''ইহারে ডাকিহ নাহি শয়ন সময়।''[১৫] কিন্তু নাটকে শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে এরূপ কোনো ঈঙ্গিত নেই।

এই নাটকে প্রধান চরিত্রগুলির এক-একজন করে সঙ্গী চরিত্র আছে, যাদের সাহচর্যে মূল চরিত্রগুলি বিকাশ লাভ করেছে। এই রীতিরই অনুসরণে যযাতির সঙ্গী চরিত্ররূপে এসেছে বিদূষক। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদূষকের উপস্থিতি নাটকের মধ্যে একদিকে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে, আবার তার দ্ব্যর্থবোধক ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ নাটকের ঘটনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। বিদূষকের উপস্থিতিতে যযাতি চরিত্রের যে রূপ ফুটেওঠে তা মহাভারতে নেই। বিশেষত সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের উপস্থিতি হাস্যরসের ভাণ্ডার হলেও সমালোচকের টিপ্পনী উপেক্ষনীয় নয় –

> ''হর্ষ, রাজশেখর প্রভৃতির নাটকে বিদূষকের চরিত্র আছে, এবং উক্ত নাট্যকাররা ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাট্যকার ভবভূতি, বিশাখদত্ত প্রভৃতির নাটকে বিদূষক নেই,

ভট্টনারায়ণের নাটকেও নেই, এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে কোনো ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণকে এক হাস্যকর বিদূষক চরিত্রে উপস্থিত করতে অনিচ্ছুক।''[১৬]

শর্মিষ্ঠা নাটকে বিদূষক রাজা যযাতির মনের অর্গল খুলতে সহায়ক হয়েছেন। বিশেষত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকের ক্ষেত্রে বিদূষক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি চরিত্র।

রাজা : রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূষক : মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা : সখে! অমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি? (২/২)

এসব সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর প্রতি যযাতির দুর্বলতার ক্রম প্রকাশ ঘটছে। নাটকের এই অংশে বিদূষকের ভূমিকা অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে 'রত্নাবলী' নাটকের বিদূষকের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি যযাতি চরিত্রাঙ্কনেও সংস্কৃত শৃঙ্গাররসাত্মক নায়কের প্রভাব পড়েছে। ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের দুষ্যন্ত চরিত্রের অনুকরণে যযাতির চরিত্র পরিকল্পনা করিতে গিয়া মধুসূদন মহাভারতের যযাতি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই।''[১৭] মহাভারতে ধীবরকন্যা সত্যবতীকে দেখার পর শান্তনুর যে মনোবৈকল্য দেখা যায়, নাটকে যযাতি চরিত্র নির্মাণের নেপথ্যে তা পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। দেবযানীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর যযাতির প্রতিক্রিয়া বিদূষকের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে - 'কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।'(২/২) নাটকের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মিলনের যে অসম্ভবতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেখানে মহাভারতের ব্যাখ্যাকার একটু অন্য রকম টিপ্পনী কাটেন-

''এই যে চলে যাবার তাড়াহুড়ো, এ কি শুধুই বামুন-ঘরের মেয়ে বলে, নাকি দেবযানীর চরিত্রের মধ্যেই সেই দর্পোদ্রিক্ত বীজ ছিল, যাতে রাজা যযাতির মতো অভিজাত ব্যক্তিও

রমণীর সাহচর্যমোহ ত্যাগ করে পালাতে চান, যেমন পালাতে চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির পুত্র কচ এককালে।''[১৮]

মহাভারতের দেবযানী চরিত্রকে বুঝেনেবার জন্য তার অতীত জীবনের ঘটনাকেও টেনে এনে বিচার করবার দিকটি নাটকে নেই। অজিত কুমার ঘোষ এই দিকটির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন,

''যিনি একবার কিশোর বয়সে প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে প্রেমাস্পদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় প্রতারিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইলেন।''[১৯]

যযাতির প্রেম উন্মত্ততাকে নিছক কামনা ভেবে নিয়ে তা প্রশমনের জন্য বিদূষক নটীর আমদানী করেছেন। প্রেম ও কামনার পার্থক্য স্পষ্ট করতে যযাতির মুখে যে সংলাপ তা তার প্রেমিক সত্তাকে প্রকাশ করে–'অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?'(২/২) শৃঙ্গার রসের প্রতিফলন নটীর গানে ব্যক্ত হয়েছে। এই গর্ভাঙ্কের শেষে যযাতি কপিল মুনিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেও এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে না, আরও কয়েকটি সংলাপে রসিক বিদূষক এবং নটীকে দেখা যায় যা নাটকের মূল ঘটনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং সমকালীন দর্শক রুচির জন্য অপরিহার্য।

শুক্রাচার্যের শিষ্য কপিলের কারসাজি নাটকে দেখা গেল না, যদিও কপিলকে 'সুচতুর' বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু যযাতি দেবযানীর প্রতি অত্যুৎসাহী তাই চাতুর্য দেখানোর প্রয়োজন পড়ল না। দেবযানী-যযাতি পরিণয় ক্রিয়ার মধ্যে যে চাতুর্য ছিল তা স্বয়ং দেবযানীই মহাভারতে দেখিয়েছেন। নাটকে জনসাধারণের কথোপকথনের মধ্যে জানা গেল– যযাতি দেবযানীর পরিণয় ক্রিয়া অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হতে চলেছে আর সেজন্য শুক্রাচার্য তার কন্যাকে নিয়ে গোদাবরীর তীরে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে এসে অপেক্ষা করছেন। যেহেতু যযাতি দেবমিত্র তাই দৈত্যদেশে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন নাট্যকার। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজকার্যের

সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথম নাগরিকদ্বয় যযাতির রাজকার্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য সমালোচনা করেন আবার শেষের নাগরিকবৃন্দ রাজার বিবাহ উপলক্ষে উল্লাস ব্যক্ত করেছে। মূলত নাটকে নাগরিকদের টেনে আনা হয়েছে কিছু তথ্য সরবরাহ করার জন্য। বিবাহের একটিমাত্র দৃশ্যে যা প্রকাশ করা যেত তা অনেকগুলি সংলাপেও ব্যক্ত করা যায় নি। অবশ্য মহাভারতে দেবযানী-যযাতির শাস্ত্রীয় বিবাহের আনুষ্ঠানিক আয়োজন নেই।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রী ও বিদূষকের দুইটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নেই। কিছু বর্ণনা ও কয়েকটি তথ্য জানা যায় মাত্র। দেবযানীকে বিবাহের পর রাজকার্য ফেলে রেখে যযাতি নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন ও যদু নামে তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। দেড় বছর কালের ব্যবধান বোঝাতে এই গর্ভাঙ্কের পরিকল্পনা, এছাড়া বৃহৎ কোনো নাট্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী-যযাতির দাম্পত্য প্রেম ও পরিণতির চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে, যা নাটকের পরবর্তী ঘটনার একটি স্তর। মহাভারত থেকে বিচ্যুত হয়ে নাটকের প্রয়োজনে এই প্রকার দৃশ্যের যোজনা মধুসূদনের নাট্যসচেতনতার নিদর্শন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাজা যযাতির দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা যখন প্রকাশিত তখনই তাঁর মনে জেগে ওঠে– গোদাবরী নদীতীরবক্ষ, 'করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে' উপবিষ্টা শর্মিষ্ঠার স্মৃতি। অশোকবনের কথা মহাভারতেও রয়েছে কিন্তু যেভাবে এখানে তা প্রদর্শিত তাতে শর্মিষ্ঠা মহাভারতের কোনো নায়িকার বদলে মধুসূদনের মনের চিরবিষাদিনী সীতাতে পরিনত হয়ে গেছেন। ''মাইকেলের সাহিত্যে নারীর জননী-পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে না, প্রেমিকা পরিচয় প্রধান।''[২০] মহাভারতে পুত্র সংখ্যার ভিত্তিটি নাটকে স্বাভাবিক ভাবেই বর্জিত হয়েছে। নাট্যকার শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন একান্ত নিভৃতে যে নির্জনতা মহাভারতে নেই। যযাতিকে দেখা মাত্রই সে আত্মগোপন করেছে। 'যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো।'(৩/২) –এই বিনম্র কোমলতা দেবযানীর কাছে অপ্রত্যাশিত। কালিদাস তাঁর শকুন্তলাকে তপোবনের স্নিগ্ধতায় যেমন সুন্দর

করেছেন মধুসূদনও তেমনি শর্মিষ্ঠা চরিত্র নির্মাণে যত্নবান হয়েছেন। ''শর্মিষ্ঠা চরিত্রে সংস্কৃত নাটকের নায়িকার চিরাচরিত কোমল লালিত্যই অনুসৃত হয়েছে।''[২১]

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে রোমান্টিক স্মৃতিচারণায় ছেদ ঘটল। চোরের হাত থেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব উদ্ধারের জন্য স্বয়ং যযাতিকে অস্ত্র ধরতে হল! মহাভারতে অর্জুনকে একবার দেখা গেছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের জন্য তৎপর হতে, –এই অংশে তার পরোক্ষ প্রক্ষেপ থাকলেও থাকতে পারে। নেপথ্য চিৎকারকে উপলক্ষ্য করে বিদূষকের 'মায়াবী দৈত্য'র ইঙ্গিতপূর্ণ প্রসঙ্গ আনবার জন্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন দেখা দিল, রাজকর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই উপস্থাপনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না।

শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির গোপন আসক্তি ব্যক্ত হওয়ার পর যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠার আকর্ষনের তীব্রতা প্রতিফলিত হয়েছে বকাসুরকে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনায়। নাটকের এই অংশটি মহাভারতে নেই, তা নাট্যকারের মৌলিক চিন্তার ফসল যা শর্মিষ্ঠাকে ভিন্ন এক মাত্রায় উত্তীর্ণ করে। বৃষপর্বা শুক্রাচার্যকে তুষ্ট করে কন্যা শর্মিষ্ঠাকে ফিরিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করলেও শর্মিষ্ঠা দাসীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে চান না। পিতা বৃষপর্বার প্রতি অভিমান বসত নয়, এখানে তার দাসী সত্তা প্রেমিকা সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বীরঙ্গনা কব্যে অসম্পূর্ণ পত্র 'যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা'য় শর্মিষ্ঠার এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে -

''কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে?''[২২]

যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠার সুপ্ত প্রেমাকাঙ্খা তাঁকে রাজদুহিতার জীবন উপেক্ষা করতে দ্বিধান্বিত করে না, সে বকাসুরকে একবাক্যে ফিরিয়ে দেয়। শুক্রাচার্যের নিকট থেকে যে অনুমোদন বকাসুর নিয়ে এসেছেন তা যেন কোন ক্রমেই রাজা যযাতির কানে না পৌঁছুয় সেজন্য শর্মিষ্ঠার

আর্তি– 'মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো।'(৩/৩) একথা বলবার পর তার কান্না যযাতির প্রতি তার অনিবার্য আকর্ষণকে প্রকাশ করেছে। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা প্রেমের এক বিষাদময়ী মূর্তিরূপে মধুসূদনের মানসকন্যায় পরিণত হয়েছেন। শর্মিষ্ঠার মনে প্রেম সঞ্চারের ভাবাবেগ গানের সুরে ভেসে উঠেছে– 'আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।'(৩/৩) প্রেমের এই গান স্বপ্নের মতো যযাতিকে আপ্লুত করেছে– 'কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না।'(৩/৩) যযাতির সম্বোধনে শর্মিষ্ঠা লজ্জিত এবং কিছুটা সংকোচবোধও করেছে। এইখানে মহাভারতের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্যই দেখা যায়। মূল আখ্যানে শর্মিষ্ঠা পরপর যুক্তিজাল বিন্যাস করে যযাতিকে জয় করেছেন। নিজের ঋতুরক্ষার জন্য ধর্মত অনুরোধ করেছেন। রূপমুগ্ধতা সত্ত্বেও যযাতি শুক্রাচার্যের নির্দেশ ভুলে যান নি–''নেয়মাহ্বয়িতব্যা তে শয়নে বার্ষপর্বণী।''[২৩] মহাভারতের ধার্মিক যযাতি আত্মদমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শর্মিষ্ঠার বাগ্মীতায় কি রূপমুগ্ধতায় তিনি বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ''মহারাজ! সখীর পতি ও আমার পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যেরও বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।''[২৪]

কাশীরাম -

''দেবযানী তোমাকে বরিল যেই ক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে।।''[২৫]

মহাভারত থেকে নাটকে রূপান্তরে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার চরিত্রের তুলনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন -

> ''মহাভারত কাহিনীর নায়িকা দেবযানী। মধুসূদনের নাটকের নায়িকা শর্মিষ্ঠা, কিন্তু নাট্য রস জমে উঠেছে দেযানীর আচরণে। মহাভারতে দেবযানী মহিমাময়ী তেজস্বিনী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাবতী আর শর্মিষ্ঠাই যেন ঈর্ষাকুলা ও কলহকারিণী। মধুসূদন দেবযানীকেই কোপনস্বভাব এবং ঈর্ষাপরায়ণ করেছেন এবং শর্মিষ্ঠাকে শকুন্তলার ও বাঙ্গালী মেয়ের আদর্শে নাটকের নায়িকা করেছেন।''[২৬]

মহাভারতে যে কথাগুলি শর্মিষ্ঠা বলেছে নাটকে সেই কথাগুলি যযাতির মুখে শুনতে পাওয়া যায়–

যযাতি : যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্মিষ্ঠা : হে নরবর! আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

যযাতি : সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ব-বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর। (৩/৩)

যযাতির মনের প্রবল ভাবাবেগ অবগত হওয়ার পরও শর্মিষ্ঠা নিজেকে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছেন। যযাতির প্রতি তার গোপন ভালোবাসা কখনো যে বাস্তবরূপ পেতে পারে তা শর্মিষ্ঠার কাছে একপ্রকার অসম্ভব স্বপ্নের মতোই ছিল। তাই প্রেমের এই চূড়ান্ত মুহূর্তেও শমিষ্ঠার চোখে জল দেখা যায়। আর এখানেই মধূসূদনের 'চিরদুঃখিনী' শর্মিষ্ঠা মহাভারতের শর্মিষ্ঠাকে অতিক্রম করে গেছে। বকাসুরকে বিদায় করে দেওয়ার পরও তার অপেক্ষা শর্মিষ্ঠাকে দৈত্যরাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার এতটুকু সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখে বৃষপর্বার রাজ্যের ব্যকুলতা প্রকাশ করেছে। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্যনীয় যযাতি দৈত্যদেশীয় বকাসুরের কথায় উচ্ছসিত হয়েছেন এবং তার যথোচিত সমাদর করার জন্য নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

চতুর্থ অঙ্কের সূত্রপাত ঘটেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে, দেবযানী শর্মিষ্ঠার বিষয় জেনে যাওয়ায় যযাতি যে সমূহ বিপদের মধ্যে পড়েছেন তা বিদূষকের কাছে ব্যক্ত করছেন। এখানেও সেই বর্ণনাত্বক উপস্থাপনা, নাট্যিক ঘটনার বিবৃতি মাত্র। দেবযানীকে উদ্দেশ্য করে শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুর একটি সংলাপ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকে উঠেছে 'তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও।'(৪/১) মহাভারতে এই উন্মোচন অতটা আকস্মিক ভাবে হয়নি। শর্মিষ্ঠার প্রথম পুত্রের জন্ম সংবাদ পাওয়া মাত্র দেবযানী তার কাছে শিশুটির পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে শর্মিষ্ঠা ঋষিপুত্র বলে উল্লেখ করেন।

অতপর আরো দুটি পুত্র সন্তান জন্মালে তাদের দেখে দেবযানীর মনে সন্ধেহের উদয় হয়। তিনি সন্তান গুলিকে দেখে যযাতিকে বললেন, ‘‘ইহাদিগের আকারপ্রকারে আপনারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে।’’[২৭] দেবযানী বালকদের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ‘‘বালকেরা তর্জ্জনীসঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দেশ করিয়া কহিল, আমাদিগের মাতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা।’’[২৮]

দেবযানী যযাতি ও শর্মিষ্ঠাকে যে কটূভাষায় অপমানিত করেন তাতে যযাতির বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক তবে তার ভয় দেবযানীকে নয়, শুক্রাচার্যকে– ‘যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে?’(৪/১) মহাভারতে এবং মধুসূদনের নাটকে উভয়ক্ষেত্রেই দেবযানীর শক্তির মূল উৎস তার পিতা। অভিশাপ দিতে পারেন এবং সে অভিশাপ বৃথা যায় না, এমন একজন পিতার অস্তিত্ব দেবযানীকে অধিকতর উত্তেজিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। শুক্রাচার্যের ক্রোধের কথা মনে করেই ক্ষণিকের জন্য তার মনে হয়েছিল শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করা উচিত হয়নি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আত্মসমালোচনায় নিজেকে পাষণ্ড বলে ধিকৃত করেন। যে শর্মিষ্ঠার জন্য তিনি পৃথিবীর মধ্যেই স্বর্গের সুখ উপভোগ করেছেন, যে নারী তার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও প্রস্তুত তার সমন্ধে বিরূপ মন্তব্য করার জন্য সে নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করবে। এখানে শাস্তির কারণটাকে শর্মিষ্ঠার দিক থেকে দেখার চেষ্টা করা হলো।

দেবযানী এই আকস্মিক তথ্য আবিষ্কারে পর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে যযাতির রাজ্য পরিত্যাগ করে গেছে। দূরতর দৈত্যদেশে কেমন করে যাবেন এই দুশ্চিন্তায় ভাবিত হলে সখী পূর্ণিকা তাকে রাজান্তঃপুরে প্রত্যাবর্তনের কথা বললে দেবযানী সক্রোধে দাসীকে ফিরে যেতে বলার মধ্যে তার সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। যযাতি সম্পর্কে তার ধিক্কার ‘এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত?’(৪/২)

তিনি এতটাই বিতৃষ্ণ হয়েছেন যে নিজেকে সধবা বলে ভাবতে পারছেন না। মহাভারতের কাহিনিসূত্রে এটা সর্বজন জ্ঞাত যে, যযাতির রাজ্য শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুই প্রাপ্ত হয়, নাটকের পরিণামেও তাই দেখানো হয়েছে। কিন্তু নিজের সন্তানদের পরিচয় 'দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র' বলে উল্লেখ করে দেবযানী তাদের উত্তরাধিকারও অস্বীকার করেছেন যযাতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণায়। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্য ধারায় বহুপত্নীক সমস্যার ক্ষেত্রে সপত্নী বিরোধ অনেকই দেখা গেছে কিন্তু তারা কেউই পতিনিন্দায় পঞ্চমুখ হননি। পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে মধুসূদনের দেবযানী আধুনিক নারীর চেতনায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শুক্রাচার্যকে স্বয়ং দেখা গেল সশিষ্য কপিলের সঙ্গে যমুনাতীর পর্যন্ত এগিয়ে আসতে যেখান থেকে যযাতির রাজ্য দেখা যায়। দেবযানী ও তার দুই পুত্রকে দেখার ইচ্ছায় শুক্রাচার্যের আগমন। অভিশাপ যেন এগিয়ে আসছে। যমুনার তীরে পিতা-কন্যার আকস্মাৎ স্বাক্ষাতের মধ্যে চমৎকার নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারতে দেবযানী যযাতিকে বলেই তার রাজ্য ত্যাগ করেছেন, তিনি সরাসরি শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, ''তাত! অধর্ম ধর্মকে পরাজয় করিয়াছে; নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্বা তনয়া আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি দুভার্গা, আমার দুইটি বৈ পুত্র নাই।''[২৯] স্পষ্টতই পুত্র সংখ্যার আধিক্যে শর্মিষ্ঠার কাছে হেরে যাওয়ায় জন্যই দেবযানীর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। যযাতি সম্পর্কে, ''সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন''[৩০] – অনুযোগের মতোই শোনায়। কন্যার এ হেন অপমানে শুক্রাচার্য স্বতোপ্রণোদিত ভাবেই অভিশাপ দিয়েছেন। অথচ নাটকে শুক্রাচার্য স্বামীর নিন্দা করার জন্য দেবযানীকে ভর্ৎসনা করেন, 'রে দুষ্ট পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতি নিন্দা করিস?'(৪/২)

যযাতির শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করাকে শুক্রাচার্য সমর্থন করেছেন। দেবযানী 'চণ্ডাল অপেক্ষা অধম' যযাতিকে অভিশাপ প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি দানের কথা বললেও শুক্রাচার্য ইতস্তত বোধ করেন। দেবযানী অপরিসীম পিতৃস্নেহের দাবিতে যমুনায় আত্মবিসর্জনের ভয় দেখিয়ে শুক্রাচার্যকে যযাতির প্রতি অভিসম্পাত করতে বাধ্য করেন। ''মাইকেল দেবযানীকে আধুনিক নারীত্বের ভূষণে ভূষিত করেছেন। শুক্রাচার্য আর দেবযানীর যুক্তি বৃথা বিপরীতমুখী হয়নি। দুজন দুই মতবাদের, এবং যেন দুই যুগের প্রতিনিধি।''[৩১]

মহাভারতে যযাতিকে দেখা গেছে নিজের কৃতকর্মের জন্য শুক্রাচার্যের কাছে যুক্তি প্রদর্শন করছেন, ''ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া ধর্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম।''[৩২] কাশীরাম দেবযানীর অভিযোগের সঙ্গে শুক্রাচার্যের নির্দেশ অবমাননা করাকেও যুক্ত করেছেন।

''গুরু-বাক্য নাহি মান করি অহঙ্কার।
এই পাপে অঙ্গে জরা হইবে তোমার।।''[৩৩]

শর্মিষ্ঠার সখী দেবকী দেবযানীর হিংস্র মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। অথচ শর্মিষ্ঠা দেবযানীর বিরূপ আচরণের নেপথ্যে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন– 'যদ্যাপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ আপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরষ্কার করি না?'(৪/৩) বস্তুত যযাতির প্রতি প্রেমে ব্যাকুল শর্মিষ্ঠার হৃদয়ে এই সব তিরষ্কার যেন পৌঁছুয় নি। যযাতির বিরহে কাতরা শর্মিষ্ঠাকে নাটকে চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দৃশ্যায়িত হয়েছে যা নাট্যকারের অন্যতম অভিপ্রায়। 'সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যাতিরেকে আমার সকলই অসুখ।'(৪/৩)

দেবযানীর অন্বেষণে চারিদিকে রথী অশ্বারোহী প্রেরণ করে যযাতি দৈবের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি নিজে যান নি, কেননা শর্মিষ্ঠাকে একা রেখে অন্য কোথাও যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন করতে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়।'(৪/৩) এমনকি নিজের প্রখ্যাত চন্দ্র বংশের ভবিষ্যৎকে তাচ্ছিল্য করেছেন শর্মিষ্ঠার প্রেমের কাছে। দেবযানীর অবর্তমানে শর্মিষ্ঠা সঙ্গে যযাতির স্বাক্ষাৎ মধুসূদনের মৌলিক ভাবনার প্রকাশ, মহাভারতে এই অবকাশ ছিল না। মহাভারতে যযাতি দেবযানীকে আনুসরণ করে শুক্রাচার্যের আশ্রমে উপনীত হয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করে আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টা করেন এবং শুক্রাচার্যের অভিশাপ প্রত্যক্ষ ভাবে কার্যকরী হয়। যযাতি তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হয়ে তা থেকে মুক্তির উপায় জেনে নেন। কাশীরাম সেই সঙ্গে শুক্রাচার্যের কন্যার যৌবনাকাঙ্খার দিকেও ইঙ্গিত করেন –

''অতৃপ্ত যৌবন মোর অতৃপ্ত কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবন।।''[৩৪]

নাটকের যযাতি শুক্রাচার্যের নিকট যান নি। অলক্ষে বর্ষিত অভিশাপ তার উপর ক্রিয়াশীল হয়েছে। জরাক্রান্ত যযাতিকে দেখে দেবযানীর মনেও অনুশোচনা এসেছে। 'পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? . . .আমার এ হৃদয় কি সামান্য কঠিন! এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়!'(৪/৩) মহাভারতকার যযাতিকে অভিশাপ দিয়েই তাকে শাপ মুক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেখানে দেবযানীর মানসিক পরিবর্তন দেখানোর সুযোগ ছিল না। নাটকে যযাতির শাপমুক্তির উপায় দেবযানীই শুক্রাচার্যের কাছে বিলাপ করে ঋষি হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করে আদায় করেছেন। আপন কর্মের জন্য দেবযানীর এই অনুশোচনাটুকু না থাকলে তাকে অমানবিক মনে হত। মহাভারতের দেবযানী সেখানে উপস্থিত থেকেও নিরব দর্শক মাত্র। যযাতি জ্যেষ্ঠপুত্রকে জরা গ্রহণের কথা বললে যদু ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। মহাভারতে যদুর তির্যক প্রত্যুত্তর ''আপনার আমা হইতে প্রিয়তর অন্য অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন।''[৩৫] একই ভাবে চারপুত্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কনিষ্ঠ পুত্র

পুরু জরা গ্রহণে সম্মত হলেন। নাটকে চার পুত্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যযাতি দুঃখ ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন তখন অযাতিত ভাবে পুরু এসে যযাতিকে বললেন, 'পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কত্যে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন।'(৫/১) অবশ্য নাটকে এদের প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত দেখা যায় নি।

নাটকের শেষ দৃশ্যে শুক্রাচার্যকে উপস্থিত করে মধুসূদন শর্মিষ্ঠাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দিলেন। 'হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।'(৫/২) মহাভারতের শুক্রচার্য বড়ো বেশী যুক্তিপরায়ণ এবং শাস্ত্রধর্মের বাহক কিন্তু মধূসূদনের শুক্রাচার্য অনেক বেশী মানবিক।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কাশীরামের মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, মহাভারতের চরিত্রগুলি আদিম কামনা চরিতার্থ করতে বড়ো বেশি যুক্তিপ্রবণ। কিন্তু মধুসূদন চরিত্র সৃজনে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি করে। তিনি তাঁর নাটকে দেবযানীকে রাজ্ঞী ও শর্মিষ্ঠাকে যযাতির প্রাণেশ্বরী করে দেখিয়েছেন। একদিকে দেবযানীর প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ ও অন্যদিকে শর্মিষ্ঠার প্রেমের স্নিগ্ধতা যযাতি চরিত্রকে পরিচালিত করেছে দৈব পীড়নে। মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনের প্রক্ষেপণে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতির ছায়া থাকলেও দেবযানী আত্মমর্যাদাবোধে মহাকাব্যের নাগপাশ ছিন্ন করে আধুনিক নারীর দৃপ্ত উচ্চারণে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষ করে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৫৩, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

২. গোলাম মুরশিদ : 'আশার ছলনে ভুলি', পৃ: ১৬১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৩২, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৫. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৬৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত'(১মখণ্ড), পৃ: ১৩২, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৭. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৬৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৮. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ৬২, ঐ।

৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৫৬, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৩২, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১১. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৭৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

১২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৪, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৩. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৮০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৩৫, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০১৩,

১৬. জগদীশচন্দ্র তর্কতার্থ (সম্পা.) : সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ২৮২, নবপত্র প্রকাশনী, ১৯৭৮

১৭. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৫১, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

১৮. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৮০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

১৯. ড. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃ: ৭৩ দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

২০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'মাইকেল মধূসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য' পৃ: ১৩৪, পুথিপত্র প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০

২১. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', পৃ: ২৮০, গ্রন্থনিলয়, চতুর্দশ সংস্করণ, ২০১০

২২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 'বীরাঙ্গনা কাব্য', পৃ: ৬৩, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

২৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খন্ড), পৃ: ১১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০০

২৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ:১৩৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৬, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০১৩

২৬. সুকুমার সেন :'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খন্ড), পৃ: ১১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ,২০০০

২৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ১৩৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ

২৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ

৩০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ

৩১. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', পৃ: ২২০, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

৩২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ১৩৭ তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৩৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৮, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩৪. কাশীরাম দাস : ঐ

৩৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ :'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ১৩৮, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮